



Pratidhwani the Echo

A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science

ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)

Volume-XI, Issue-IV, July 2023, Page No.171-176

Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India

Website: <http://www.thecho.in>

বরাক উপত্যকার বাংলা কবিতার স্বরূপ সন্ধান: নির্বাচিত পাঠ

ড. সৌমিত্র নাথ

সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শ্রীকৃষ্ণ সারদা কলেজ, হাইলাকান্দি, আসাম, ভারত

Abstract:

Literary works are time dependent, the poet is not outside of this time and society, so their creation takes shape by thinking about this time and society. The works of poets and writers of Barak are no exception. People's love in the society - love, exploitation, struggle, natural environment, etc. has also provided the material for Barak's poets to write. Sometimes the joy of meeting, the joy of achievement and sometimes loneliness is seen in their poems. Love of nature, love of humanity and sometimes love of the country are their poems

They wrote their poems on the love of humanity and sometimes on the love of the country. Sometimes they sang the joy of life and sometimes they wrote poems in the spirit of death. Religious awareness, pain of being a refugee, talk of Barak river, affection for native land, pain of emigration, responsibility towards society, poems about seasons, historical thoughts, folk culture, geographical awareness etc. are the main focus of Bengali poetry of Barak

Many talents are yet to be discovered by us. Many creations face destruction before they manifest. Talents do not get exposed because of lack of proper system and infrastructure. Our Barak Valley has such a fluent, strong poets and their works, we do not practice their thoughts, nor do we come forward to do it. Because, in a word, as Kabiguru said, 'what we want that we want by mistake what we get that we don't want'.

কবিতা কবির মনের স্বতস্কৃর্ত প্রকাশ। কবিতায় কবিমনের ভাব, আবেগ, দর্শন তাৎপর্যময় হয়ে প্রকাশিত হয়। কবিতা প্রকাশিত হয় সমাজের বহুমাত্রিক বাস্তব নিয়ে। সাহিত্য রচনা সময় সাপেক্ষ, এই সময়ের নানা অভিঘাত সাহিত্যের একটি শাখা কবিতাতেও রূপ লাভ করে থাকে। কবি এই সময় ও সমাজ বহির্ভূত নন, তাই এই সময়ের এবং সমাজের কথা চিন্তা করেই তাঁর সৃষ্টি রূপ পায়। সময় ও সমাজকে বাদ দিয়ে সাহিত্য রচনার কল্পনা করা যায় না। বরাকের কবি- সাহিত্যিকদের রচনাও এর ব্যতিক্রম নয়। সমাজে মানুষের প্রেম- ভালোবাসা, শোষণ, সংগ্রাম, প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি বিষয় বরাকের কবিদেরও রচনার রসদ জুগিয়েছে। কখনো মিলনের আনন্দ, প্রাপ্তির আনন্দ আবার কখনো নিঃসঙ্গতা দেখা যায় তাদের কবিতায়। প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রেম আবার কখনো স্বদেশ প্রেমে তাঁরা তাঁদের কবিতা নির্মাণ করেছেন। নদী, পাহাড়, অরণ্য, গাছপালা ইত্যাদির সৌন্দর্য বরাকের কবিদের কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে

বার বার। কখনো তারা জীবনের জয়গান গেয়েছেন আবার কখনো মৃত্যু চেতনায় কবিতা লিখেছেন। ধর্মীয় সচেতনতা, উদ্বাস্ত হওয়ার বেদনা, বরাক নদীর কথা, জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ, দেশত্যাগের যন্ত্রণা, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, ঋতু বিষয়ক কবিতা, ইতিহাস ভাবনা, লোকসংস্কৃতি, ভৌগোলিক সচেতনতা ইত্যাদি বরাক উপত্যকার বাংলা কবিতার মূল কেন্দ্রীয় বিষয়।

কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি এই তিনটি জেলা নিয়ে বরাক উপত্যকা গঠিত। বরাকের কবিতা রচনা ধারার ঐতিহ্য আনুমানিক চারশো বছরের পুরোনো। বরাক উপত্যকার বাংলা কবিতার বিবর্তন সম্পর্কে সামগ্রিক তথ্যবহুল ধারণা পাওয়া যায় ‘ঈশানের পুঞ্জমেঘ’ গ্রন্থে, সম্পাদক শক্তিপদ ব্রহ্মচারী ও বিশ্বতোষ চৌধুরী খুব সহজ করে ধারাবাহিকভাবে কবি ও তার কিছু কবিতার উল্লেখ করেছেন। বরাক উপত্যকার কাব্যের ভূবনে ভুবনেশ্বর বাচস্পতির নাম প্রথম পাওয়া যায়, যিনি আনুমানিক ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে বর্মণ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য রচনা করেছিলেন। তিনি মহারাজ সুরদর্পনারায়ণের রাজত্বকালে পয়ার ছন্দে ‘নারদীয় রসামৃত’ বাংলায় অনুবাদ করেন। রাজাদের মধ্যেও আবার কেহ কেহ তখন কবিতা রচনা করেছিলেন এ ক্ষেত্রে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বর্মণ পিতা হরিচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে কাছাড় রাজ্যের সিংহাসনে বসেন তার রচিত ‘রামলীলামৃত’ ও ‘বসন্তবিহার’ নামে দুটি পুঁথির উল্লেখ আছে। রণচণ্ডী বিষয়ক পদাবলী ও সংগীত তিনি রচনা করেছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর গোবিন্দ চন্দ্র ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং তার রচিত ‘রসোৎসব লীলামৃত’ পরবর্তী সময়ে মুদ্রিত হয়। এরপর বরাক উপত্যকায় আধুনিক সাহিত্যচর্চার সূচনা করেন রামকুমার নন্দী (১৮৩১-১৯০২) মাত্র ১৪ বছর বয়সে ‘দাতা কর্ণ’ নামে যাত্রাপালা রচনার মধ্যে দিয়ে সাহিত্য জীবনে আসেন। তিনি এগারোটি যাত্রাপালা, তিনটি পাঁচালী ও অসংখ্য সংগীত রচনা করেন। মধুসূদন দত্তের বীরাজনা কাব্যের উত্তরে ‘বীরাজনা পত্রোত্তর’ (১৮৭২) কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বিশ শতকের মধ্যভাগে বৃহত্তর সুরমা-বরাক উপত্যকায় কয়েকজন শক্তিশালী কবির আবির্ভাব হয় মূলত বলাকা (১৯৩৭) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে।

এই কবিগুষ্ঠীর মধ্যে রয়েছেন দেবেন্দ্র কুমার পাল চৌধুরী (১৯০৭- ২০০৩), অশোক বিজয়র রাহা (১৯১০-১৯৯০), পরমানন্দ সরস্বতী (১৯১৫-১৯৮০), রামেন্দ্র দেশমুখ্য (১৯১৭-১৯৮৬) প্রমুখ। এদের সমসাময়িক এবং উত্তরসূরী হিসেবে বরাকে অর্ধশতক ধরে কবিতার পাল তুলে যাত্রা করছেন করুণা রঞ্জন ভট্টাচার্য (১৯২৯), অনুরূপা বিশ্বাস (১৯৩২), অতুল রঞ্জন দেব (১৯৩৪), শক্তিপদ ব্রহ্মচারী (১৯৩৭), ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ (১৯৩৮), ছবি গুপ্তা (১৯৩৮), বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য (১৯৩৯), তপোধীর ভট্টাচার্য (১৯৪৯), মহুয়া চৌধুরী (১৯৫০), আরও কিছু পরে আশুতোষ দাস (১৯৫৫), আশিসরঞ্জন নাথ (১৯৬০), জসীমউদ্দীন লস্কর (১৯৬১), দেবদত্ত চক্রবর্তী (১৯৬৮), জিতেন্দ্র নাথ (১৯৭০) প্রমুখ কবিরা। পূর্বোক্ত কবিদের কয়েকজন স্থানীয়, আবার কয়েকজন দেশভাগের প্রাক্ মুহূর্তে বা কিছু পরে চলে এলেন তৎকালীন কাছাড় জেলায়, কেউ বা চাকরির ক্ষেত্রে আসামের বরাক উপত্যকার বাসিন্দা হয়ে উঠলেন। তাঁদের কেউ রবীন্দ্র, কেউ নজরুল, কেউ মধুসূদন প্রভাবিত। অনেকে স্বকীয় ভাবনায় সমাজের সহজ ও কঠিন বিচিত্র বাস্তব তাঁদের লেখনীর রসদ জুগিয়েছেন। এদের ছত্রছায়ায় আজকের নব প্রজন্ম কবিতার নিশান হাতে এগিয়ে যাচ্ছেন।

বরাকের কবিতার জগতে যে পত্রিকা গুলো প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল তার কয়েকটি নাম এখানে উল্লেখ করছি। ১৯১০ সালের ‘নবযুগ’ নামে মহেন্দ্র চৌধুরীর সম্পাদনায় শিলচর থেকে সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ

একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের সন্ধান মেলে। তারপর ক্রমান্বয়ে সুরমা (১৯১১), শিক্ষাসেবক (১৯২৫), ভবিষ্যৎ (১৯২৬) বর্তমান (১৯৩০), বলাকা (১৯৩৭), সশুভ (১৯৩৭), কৃষক (১৯৩৭), চমক (১৯৩৯), বিজয়িনী (১৯৪০), দিগন্ত (১৯৪০), অতন্দ্র (১৯৬৩), শতক্রতু (১৯৭৩) ইত্যাদি, করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত শ্রীভূমি (১৯১৫), বিবর্তন (১৯৪১), আলো (১৯৫১), কিশোর (১৯৫২), অগ্রদূত (১৯৫৩) ইত্যাদি হাইলাকান্দি থেকে প্রকাশিত পূর্বাণ (সাণ্ডাহিক), সাহিত্য (১৯৬৯), বেলাভূমি, প্রবাহ (১৯৮৭), স্বপ্নীল (১৯৯৭), আলোহাওয়া (২০০০) ইত্যাদি আরো বহু সাণ্ডাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক পত্রিকাকে ঘিরে বরাকের কবি সত্তা বিকশিত হয়েছে।

এই পর্বে বরাকের বিশিষ্ট, শক্তিশালী, প্রতিভাধর কয়েকজন কবি অশোক বিজয় রাহা, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী এবং বিজিত কুমার ভট্টাচার্যের কয়েকটি কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করে বরাকের বাংলা কবিতার প্রকৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করব। যদিও কবিতার ব্যাখ্যা অত্যন্ত কঠিন। কবিতাকে জানতে গেলে কবিকে খুব ভালো করে জানতে হয়। তাঁর ভালো লাগা, মন্দ লাগা, তাঁর চেতনার জগৎ, তাঁর পারিপার্শ্বিক এবং সেই সঙ্গে তাঁর সময়টাকেও বোঝা অত্যন্ত জরুরী। তাছাড়া কবিতা সম্পর্কে বলতে গেলেও সম্পূর্ণ বলা সম্ভব হয় না। কবিতায় শব্দ সীমাতীত চিন্তাশিক্ষিত ধারণা করে থাকে। পাঠক নিজস্ব জ্ঞানের পরিসর অনুযায়ী বলা থেকে না বলা পরিসরে প্রবেশ করতে পারেন।

অশোক বিজয় অবিভক্ত ভারতের শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বঙ্কবিহারী রাহা ছিলেন কাছাড়ের চা বাগানের কর্মী এবং মাতা ব্রহ্মময়ী দেবী। তাদের চার পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে অশোকবিজয় কনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর পিতা চা বাগানের কর্মী ছিলেন বলে তাঁর শৈশব কেটেছে কাছাড়ের আদিম বনানী পরিবেশে। তবে কৈশোরে শ্রীহট্ট শহরে সেখানে এক ইংরেজি স্কুলে পড়াশুনা করেন। শ্রীহট্টের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে তিনি প্রবলভাবে সক্রিয় ছিলেন। পরবর্তী সময়ে করিমগঞ্জ কলেজ এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। অসংখ্য কবিতা, প্রবন্ধ গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। তাঁর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল- ‘ডিহাঙ নদীর বাঁকে (১৯৪১)’, ‘রুদ্রবসন্ত’ (১৯৪১), ‘ভানুমতীর মাঠ’ (১৯৪২), ‘জলডম্বুর পাহাড়’ (১৯৪৫), ‘ঘন্টা বাজে’ (১৯৮১), ‘পর্দা সরে যায়’ (১৯৮১), ‘পৌষ ফসল’ (১৯৮৩) প্রভৃতি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ - এদের কবিতার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছেন। নিসর্গ প্রকৃতির নানা জীবজন্তু পারিপার্শ্বিক, প্রাকৃতিক নানা উপাদান তার কবিতায় চিত্ররূপময় হয়ে ফুটে উঠেছে, তার ‘একটি সন্ধ্যা’ নামক কবিতা পাঠ করলে অতি সহজেই জীবনানন্দের রচনা তথা তার ‘হায় চিল’ কবিতাটি স্মরণে অতি সহজেই ভেসে ওঠে। ‘একটি সন্ধ্যা’ কবিতায় পাই-

“শেয়াল ডাকা রাত্রি আসে যেই আসি ওর কাছে, বাদুড়গুলো ঝাপটা মারে কাক-ডুমুরের গাছে, মাথার উপর ডাকল পেঁচা, চমকে উটি- আরে! আধখানা চাঁদ আটকে আছে টেলিগ্রাফের তারে!”^১

কবিতায় এক দিকে শিয়াল ডাকছে, শিয়ালের ডাক আমাদের কান্নার মতই মনে হয়। বাদুরগুলো ঝাপটা মারে কাক ডুমুরের গাছে, ছিনিয়ে নেওয়া আসলে প্রতারণার প্রতীক। স্বাভাবিক জীবনে এমন তো হয় না? যেখানে অভাব, অনাহার, দুঃখ সেখানে ঝাপট মারা। আধখানা চাঁদ যে পূর্ণ চাঁদ নয়, যার গতি অবরুদ্ধ। চন্দ্র তো গতির প্রতীক, নিরন্তর চলমানতার প্রতীক, চাঁদের আটকে যাওয়া স্তব্ধতা আর রুদ্ধ

সময়ের পরিচয় দেয়। দৈন্য, দারিদ্রে ক্লিষ্ট, অভুক্ত, অনাহারে অস্তিচর্মসার শরীর খিদের জ্বালায় অস্থির সময়ের সেই স্বরূপ তার 'রাহু' কবিতায়ও ধরা পড়েছে,

“নগ্ন দেহ অস্তিচর্মসার
বাড়ায়েছে কঙ্কালের হাত -
কোটরের গর্তে জ্বলে চোখ
মুখের বিকট হাঁ- সারাদিন রোদ খায় তালু
দাউ দাউ পেটের গহ্বর?”^২

সারাদিন রোদ তালু খায় -এ শব্দবন্ধ অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময়। এখানে সংগ্রামী জীবনের পরিচয় পাই। যেখানে রয়েছে শরীর অস্তিচর্মসার, পেটে খিদের জ্বালায় দাউ দাউ করতে থাকা অত্যন্ত আবেগসম্পৃক্ত বর্ণনা। অশোক বিজয় রাহার কবিতায় প্রকৃতি, প্রেম, মৃত্যুচেতনা, গ্রামীণ পাহাড়-পর্বত, নদী-অরণ্য তাছাড়া নাগরিক জীবনচর্যার নিদর্শনও সহজলভ্য।

বরাক তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট শক্তিশালী কবি হচ্ছেন শক্তিপদ ব্রহ্মচারী। শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর জন্ম ১৯৩৭ সালে ব্রিটিশ ভারতের শ্রীহট্ট জেলায়। তার পিতার নাম শশীভূষণ ব্রহ্মচারী ও মায়ের নাম প্রভাবতী দেবী। দেশভাগের পর তিনি বরাক উপত্যকায় আসেন এবং হাইলাকান্দীর এস এস কলেজে ছয় মাস অধ্যাপনা করে শিলচর গুরুচরণ কলেজে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'সময় শরীর হৃদয়' (১৯৭১), 'এই পথে অন্তরা' (১৯৭৬), 'অনন্ত ভাসানে' (১৯৮৪), 'কাঠের নৌকা' (১৯৯৪), 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৯৫), 'লঘু পদ্য' (২০০০) ইত্যাদি। বিশ শতকের ষাটের দশক থেকে মূলত শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কবি খ্যাতি 'অতন্দ্র' (১৯৬৩) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়ে। প্রেম-প্রকৃতি, আনন্দ- বিষাদনির্ভর তার কবিতাগুলো বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। 'শক্তিপদ ব্রহ্মচারী আত্মহত্যা বিষয়ক প্রস্তাব' নামক কবিতায় লিখেছেন-

“কিছুকাল ছিলাম ভালোই
অপক্ক বিশ্বাস নিয়ে কিছুকাল ভালোই ছিলাম। কাল রাত বারোটা পঁচিশে
হঠাৎ বুকের মধ্যে একুশটা হাতুড়ির পেটা
অনুভব করেছি অক্লেশে।”^৩

'বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটানো' এছাড়া কবিতায় উল্লেখিত 'দেয়ালের ঘড়ি খেমে যাওয়ার' প্রসঙ্গ বিশ শতকের মধ্যপর্বে অস্থির সময় পর্বকে সূচিত করে। 'মানুষের কাছেই মানুষ' নামক কবিতায় বিষয়টি আরও স্পষ্ট, কবি যেমন বলেছেন, 'মানুষের কাছেই মানুষ বড় অসহায়, ভিক্ষুকের কাছে ভিক্ষুক হাত পাতো' ভিক্ষুকের কাছে ভিক্ষুকের হাত পাতা চিত্রকল্পটি সমাজের অর্থনৈতিক দৈন্যতা প্রকাশ করেছে।

বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা, বাংলা ভাষাকে প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা করে বাঁচিয়ে রাখা, বাংলা ভাষাকে সাবলীল করে তোলার দায়ভার নিয়েছেন এখানকার কবি সকলে। প্রত্যেকের রচনায় ভাষা আন্দোলন ভাষার প্রতি ভালোবাসা, ভাষাকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার নিরন্তর প্রয়াস রয়েছে। কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী এমনি ভাব প্রকাশ করেছেন তাঁর 'উনিশে মে ১৯৬১- শিলচর' নামক কবিতায় কবি লিখেন-

“দশটি ভাই চম্পা আর একটি পারুল বোন কলজে ছিড়ে লিখেছিল, 'এই যে ঈশান কোণ— কোন ভাষাতে হাসে কাঁদে কান পেতে তা শোন।

শুনলি না তো এবার এসে কুচক্রীদের ছা

ত্রিশির লাখের কণ্ঠভেদী আওয়াজ শুনে যা- 'বাংলা আমার মাতৃভাষা, ঈশান বাংলা মা!'"^৪

এগারোজন শহীদের স্মৃতি মছন করেছেন এখানে কবি, যারা কলজে ছিঁড়ে প্রতিবাদ করেছিল ভাষার জন্য। এছাড়া দেশাত্মবোধ, লৌকিক উপাদান, মিথ- পুরাণের নানা প্রসঙ্গ রয়েছে তার কবিতার বিষয় হিসেবে। চিত্রকল্পের প্রতীকী ব্যঞ্জনায়ে প্রেম প্রকৃতি ও মানুষকে কবিতায় ধারণ করেছেন কবি। অধ্যাপক বিশ্বতোষ চৌধুরী কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কবিতার ভুবন সম্পর্কে যেমন বলেছেন-

“কবি শক্তিপদ জীবনচর্চা ও জীবনচর্যায় নির্লিপ্ত উদাসীন, নিরাসক্ত ও আত্মনিয়ন্ত্রিত। তাই তাঁর কবিতাও স্মৃতিকাতরতা, ঐতিহ্যপ্রিয়তা, বিষাদময়তা এবং চিত্রকল্পের প্রতীকী ব্যঞ্জনায়ে আধুনিকতার তারসপ্তকে বাঁধা।...ঈশ্বর নয় মানুষই তার আরাধ্য নারী ও প্রকৃতিই সৌন্দর্য, সমসাময়িক সময়ই তার প্ল্যাটফর্ম।”^৫

হাইলাকান্দি এস এস কলেজের অধ্যাপক বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্যের জন্ম আসামের করিমগঞ্জ জেলায় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে। ‘কেউ প্রবাসী নয়’ (১৯৭১), ‘জেগে আছো স্তব্ধতায়’ (১৯৮১), ‘সুন্দর যেখানে খেলা করে’ (১৯৯১), ‘মহাভারত কথা’, ‘পুনর্ভবা’, ‘ও ছেলে বাউল ছেলে’, ‘ভালো আছি সকলের সঙ্গে ভালো আছি’ ইত্যাদি তার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। তার কাব্যগ্রন্থে কাব্য সাধনায় প্রেম, নৈসর্গের পৃথিবী, দেশভাগের যন্ত্রণা, না পাওয়ার দুঃখ ইত্যাদি সামাজিক প্রাসঙ্গিক বিষয় রূপায়িত। কবি তার অর্ধশতাব্দী ধরে তার কাব্যজীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন দাঙ্গা, মহামারী, মন্বন্তরে দুঃখ- লাঞ্ছনা -যন্ত্রণা তাছাড়া আমাদের দেশ জুড়ে দেশ বিভাগ ও দেশত্যাগ ইত্যাদি সমাজের বিভিন্ন ক্ষত। সেই আধার থেকেই তিনি দীর্ঘদিন মাসিক ‘সাহিত্য’ পত্রিকা সম্পাদনা করছেন।

বিজিত কুমার ভট্টাচার্য তাঁর ‘বাড়ি’ নামক একটি কবিতা যদি দেখি, কবিতায় প্রকৃতির সুরক্ষার জন্য সরব হয়েছেন। আজকে সবদিকে প্রকৃতির ধ্বংসলীলা চলছে নিরন্তর। মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে তার ভারসাম্য নষ্ট করেছে। ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হচ্ছি আমরা নিজেই। ক্রমাগত বাড়ি বানানোর লক্ষ্যে আজকে প্রায় একশ শতাংশ লোকই পাথর, সিমেন্ট, কাঠ ব্যবহার করে বাড়ি তৈরি করছে। এতে ক্রমাগত তারা পরিবেশকে ধ্বংস করে চলেছে কবি তাঁর ‘বাড়ি’ নামক কবিতায় লিখেছেন-

“সকলেই ভালোমানুষের মতো মুখ করে আছে। প্রত্যেক কবিরই কিছু অভিজ্ঞতা থাকা চাই বাড়ি ঘর প্রস্তুত করার, ফুল কিংবা সজি বাগানের সজ্ববদ্ধ হাতে কাটে গাছ, বসত গড়ার নামে প্রকৃতির পিছু নিয়েছে মানুষ, অবকাশ কই তার ভালোবাসার, কিংবা নিভৃত গানের?”^৬

কবির মনে বড় প্রশ্ন জাগে একটা বাড়ি কেমন হবে? ‘পাথর, সিমেন্ট, কাঠ দিয়ে কী বাড়ি তৈরি হয়?’ তবে ‘সেটা বাড়ি হয় না আশ্রয়?’ এইসব প্রশ্ন নিয়ে কবি এ কবিতার কায়া নির্মাণ করেছেন। যখন বাড়িটা তৈরি হতে শুরু হয় তখন সংঘবদ্ধ ভাবে হাত বুলিয়ে প্রথমেই ধ্বংস করা হয় সেখানে থাকা ফুল, সজী ইত্যাদির সবুজ বাগান। আমাদের ক্রমাগত জন বিস্ফুরণে আমরা কোন ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, সবুজ প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে করতে। প্রকৃতিকে ধ্বংস করে আদৌ কী আমাদের ‘বাড়ি তৈরি হয়?’ তাই কবির বিষাদময় উক্ত,

“ভালোমানুষের মতো গড়ে তুলবে বাড়ি, এই সবুজ বাগানে,

কার বাড়ি?, পাথরে সিমেন্টে কাঠে বাড়ি হয়, বাড়ি না আশ্রয়?”^৭

বরাকের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সমস্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে তার সংযোগের অসুবিধার জন্য ‘বরাকভূমির লোক এভাবেই চলে’ নামক কবিতায় কবি দেখিয়েছেন কিভাবে ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যগুলোর সঙ্গে বরাক উপত্যকার সংযোগ সুতোয় গাঁথা। এর যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত সংকটময় একদিকে নদী, একদিকে পাহাড় মধ্যখানে বিপদশঙ্কুল রাষ্ট্র। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বারে বারে এর যাতায়াত ব্যবস্থা বন্ধ হয়। ধস নেমে রেলপথ, সড়ক পথ, আবহাওয়ার জন্যে আকাশ পথ সব দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বরাক উপত্যকা। এখানে ব্যক্তিগত কারণ নয় সমাজের কারণেই কবি চিন্তা গ্রস্ত, আর অন্যান্য কবিরাও তেমনি মানব সমাজের জন্য চিন্তা গ্রস্ত।

বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য সাম্যবাদী কবি তিনি সমাজে মৈত্রীর পক্ষপাতী। তবে তাঁদের কবিতায় প্রতিবাদ আছে, আবার উত্তরণের পথও দেখিয়েছেন তাঁরা। এরা প্রত্যেকেই বৃহৎ এক কালপর্বের কবি, বৃহৎ সময়ের কবি সময়ের বিচিত্র তারতম্য তাঁরা দেখেছেন। প্রত্যেকের বহু কাব্যগ্রন্থ রয়েছে, বহু কবিতা রয়েছে সুতরাং স্বল্প পরিসরে এদের কবিতার বৈশিষ্ট্যকে সীমায়িত করা সহজ ব্যাপার নয়, সম্ভবও নয়। আলোচ্য কবিদের কবিতার বিষয় একে অন্যের সাথে মিলে যায় কারণ তাঁরা একই সময় পর্বের কবি। দেশভাগের, দাঙ্গার, দেশত্যাগের, মন্বন্তরের, সম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী। তাদের রচনায় আছে নিম্নবর্গীয় চেতনা, নারীচেতনা, উপনিবেশোত্তর চেতনা ইত্যাদি আরও বিভিন্ন বিষয়। এদের প্রত্যেকের কবিতা আলাদা করে বিচার্য ও সন্ধানযোগ্য। তারা মূলত সময় সচেতন কবি তাই এদের রচনা ধারা নিয়ে ব্যাপক চিন্তন ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। ভবিষ্যতে ভিন্ন আঙ্গিকে তাদের রচনাধারার সুর নির্ণয় করার প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এবারের মতো পরিসমাপ্তি টানছি। বরাক উপত্যকার ভাষা- সংস্কৃতিচর্চা খুবই প্রয়োজন কারণ ভৌগোলিক দিক থেকে বিপন্ন হওয়ায়, ভালো যাতায়াত ব্যবস্থা না থাকায় এই অঞ্চলের ভাষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যথার্থ মর্যাদায় বিস্তার লাভ করেনি। এখনও বহু প্রতিভা আমাদের আবিষ্কার হয় নি। বহু সৃষ্টি প্রকাশের পূর্বেই ধ্বংসের মুখোমুখি হয়। উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিভা প্রকাশ পায় না। আমাদের বরাক উপত্যকায় এত সাবলীল, বলিষ্ঠ কবি ও তার রচনাসম্ভার রয়েছে আমরাও তার চিন্তাচর্চা করি না, করতে এগিয়েও আসি না। কারণ, এককথায় কবিগুরু যেমন বলেছিলেন- ‘যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।’

তথ্যসূত্র:

- ১। ব্রহ্মচারী শক্তিপদ, চৌধুরী বিশ্বতোষ (সম্পা), ‘ঈশানের পুঞ্জমেঘ’, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯২, পৃ. ২১।
- ২। তদেব পৃ. ২০
- ৩। ব্রহ্মচারী শক্তিপদ, ‘কবিতা সংগ্রহ’, অক্ষর পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ-বইমেলা ২০১১, পৃ.১০।
- ৪। তদেব পৃ.১০৩
- ৫। দেবনাথ ড. ননীগোপাল, ‘ঈশান বাংলার কবি ও কবিতা’, অক্ষর পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ-২০১১, পৃ.১২৯।
- ৬। ব্রহ্মচারী শক্তিপদ, চৌধুরী বিশ্বতোষ (সম্পা), ‘ঈশানের পুঞ্জমেঘ’, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯২, পৃ. ৮৫।
- ৭। তদেব পৃ. ৮৫